বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান : যে বিচ্যুতিগুলো এড়ানো যেত

ফিরোজ আহমেদ

বহু বছরে বাংলা একাডেমির নেয়া মহোত্তম উদ্যোগ হলো বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান। একইসঙ্গে অন্য অনেক কিছুর মতোই এটি বাংলা একাডেমির অতৃপ্তি জাগানো আরও একটি উদ্যোগ। বিবর্তনমূলক অভিধান রচনার এই প্রয়াসটিকে নানান দিক থেকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই লেখাটিতে।

সকল বিবেচনাতেই বাংলা একাডেমি এবং অভিধান সংশ্লিষ্ট সকলে ধন্যবাদ পেতে পারেন বাংলা শব্দের বিবর্বতনের মানচিত্রটি আবিষ্কারের এই প্রয়াসটির জন্য। আমরা যেসব শব্দ হরহামেশা ব্যবহার করি, সেগুলোর সম্ভাব্য প্রথম উল্লেখ কোথায় পাওয়া গেল, সেগুলো অর্থের কী কী বদলের মধ্য দিয়ে কিংবা নতুনতর তাৎপর্য যুক্ত হয়ে, অথবা এমনকি অর্থ হারিয়ে সংকীর্ণ হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছল, ভাষার সেই বিবর্তনের জ্ঞান জীবজগতের বিবর্তনের চেয়ে কম বিচিত্র নয়। সমাজের মননের রূপান্তরের ইতিহাসই গ্রন্থিত থাকে শব্দের এই রূপান্তরের খেলায়। এই গভীর ও জটিল সন্ধানকার্যটি খুব সহজসাধ্য নয়, বাংলা একাডেমিরই এমন কাজের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হবার কথা। বাংলা একাডেমি সেই উদ্যোগটি নিয়েছে, তাদের অভিনন্দন জানিয়েই তাই এ প্রকল্পটির পর্যালোচনা শুরু করা যাক।

এক.

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধানের (বিবাঅ) প্রধান সম্পাদক গোলাম মুরশিদ বিশাল এই উদ্যোগের লক্ষ্য বোঝাতে আমাদের জানিয়েছেন : "কেবল শব্দের চেহারা এবং অর্থের ক্রমপরিবর্তন এটুকুই নয়, আমাদের বিবর্তনমূলক অভিধানে আরও আছে : একটা শব্দ প্রথমবার কখন ব্যবহৃত হলো, তার সময় এবং দৃষ্টান্ত। সেই সঙ্গে তার তখনকার অর্থ। তারপর শব্দের অর্থ বদলে গিয়ে থাকলে, তার দৃষ্টান্ত। সেই সঙ্গে সে দৃষ্টান্তের তারিখ এবং অর্থ। সেটি কে ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর নামও আছে সেই সঙ্গে। যেমন, আনুমানিক ১৫৫০ সালে চণ্ডীদাস লিখেছিলেন, 'সাধ বহু করে বিহি করে অনুবাদ।' এখানে অনুবাদ কথাটার মানে প্রতিকূলতা। আনুমানিক ১৬৫০ সালে মাধবাচার্য্য অনুবাদ লেখেন প্রশংসা অর্থে, 'ধন্য ধন্য করিয়া করিল অনুবাদ।' একই সময়ে বিজয় গুপ্ত অনুবাদ কথাটা লেখেন অপরাধ বা দোষ অর্থে, 'নাহি দোষ অনুবাদ খেমা কর আমা।' আনুমানিক একই সময়ে জ্ঞানদাসও অনুবাদ শব্দটা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার অর্থ করেছেন বাসনা, 'মনে ছিল অনুবাদ পুরাল মনের সাধ।' অনুবাদ অর্থ বিতর্কও হয়, যেমন, বাদ-অনুবাদ। বর্ণনা অর্থেও অনুবাদ শব্দটা ব্যবহৃত হয়, যেমন, গুণানুবাদ। কিন্তু একেবারে ভুল অর্থে অনুবাদ শব্দটা ব্যবহার করেছেন অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৮৪২ সালে। তিনি এ শব্দ দিয়ে বুঝিয়েছেন 'তরজমা' অর্থাৎ 'ট্রান্সলেশন'। এখন আমরা এই ভুল অর্থেই অনুবাদ শব্দটা ব্যবহার করি। এ অভিধানে এভাবে প্রতিটি শব্দের ক্রমবিকাশের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। শব্দের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস হলো বিবর্তনমূলক অভিধান।" (বিবর্তনমূলক অভিধান কী করে হলো?, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, *দৈনিক প্রথম আলো*)

বিববর্তনমূলক অভিধান কী এবং কেন, সেটা গোলাম মুরশিদের এই আলোচনাতেই স্পষ্ট। বিবর্তনমূলক একটি অভিধানের কোনো ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা উদ্‌ঘাটন করতে চাইলেও তার ক্ষেত্র কী হবে, তারও ভিত্তি হিসেবে এই দিকনির্দেশনামূলক আলোচনাটাকে গ্রহণ করা যায়। কার্যকর একটা বিবর্তনমূলক অভিধানের সবচেয়ে বড় সার্থকতা হবে একেকটা শব্দের সম্ভাব্য সবচেয়ে পুরনো ব্যবহারের সময়টিকে উদ্‌ঘাটন করা। কোন্ সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটা শব্দের জন্ম হলো, সেই বিষয়ে ভাবনাকে উস্কে দেবে এই জ্ঞান। 'অনুবাদ' শব্দটির বেলায় বিবাঅ- র যে সাফল্যের কথা গোলাম মুরশিদ আমাদের জানালেন, এর মতো নিশ্চয়ই আরও বহু শব্দের ঠিকুজি নির্ধারণে সফল হয়েছে প্রকল্পটি। কিন্তু প্রকল্পটির দুঃসাহস এবং বাস্তবে বহুবিধ সাফল্যের পরও সামগ্রিক বিবেচনায় বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধানের কিছু গুরুতর ত্রুটি চোখে পড়ার মতো। খুবই এলোপাতাড়ি একটা নমুনা জরিপেই দেখা গেল, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের বেলায় বিবাঅ এই রূপান্তরের যথাযথ উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হয়নি। অর্থের বাঁকবদলের বেলায় এই ব্যর্থতার পাল্লা মনে হয়েছে আরও ভারীই হবে। আরও দুঃখজনক হচ্ছে, যে সাহিত্যিক উৎসগুলো থেকে আলোচ্য ভুক্তিগুলোর প্রাচীনতর উল্লেখ খুঁজে পাওয়া সম্ভব, সেগুলো আমাদের জাতীয় ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ সব উপাদান। ফলে আশঙ্কা হয়, বিবাঅ হয়তো বাংলা ভাষার ইতিহাসের কোনো কোনো চড়াই-উতরাই প্রতিফলনে অসফল হয়েছে।

ঘটনাক্রমে, নিতান্তই শৌখিন অনুশীলন থেকে পুরনো গ্রন্থাদি থেকে শব্দচয়নের একটা অভ্যাস তৈরি হয়েছিল। এই অভিধানটির সাথে সেই শব্দগুলোর কালক্রম মেলানোর চেষ্টা করতে গিয়ে প্রায়ই ধাক্কা খেতে হয়েছে। অবশেষে বোঝা গেল বিষয়টা, সংখ্যায় কতগুলো শব্দে বিবাঅ সঠিক বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরতে সফল বা ব্যর্থ হয়েছে, গুনে গুনে তার হিসাব মেলানোর নয়; বরং সেটি অভিধান রচনার মৌলিক পরিকল্পনাতেই কিছু গলদের ইঙ্গিতবাহী।

আমরা তাই কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ধরেই ধীরে ধীরে দেখানোর চেষ্টা করব, বিবাঅ যে দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলো প্রদর্শন করেছে, সেটি অল্প বা অজস্র ভুল ভুক্তির সংখ্যা দিয়ে বোঝা যাবে না; বরং তার গঠনকাঠামো ও পরিকল্পনার মাঝেই এই গুরুতর ত্রুটিগুলোর বীজ লুকিয়ে আছে। বিপুল শ্রম ও অর্থের এই কর্মযজ্ঞটি সফল হতে পারত আরও গোছানো ও পরিকল্পিত একটা উদ্যোগে। পৃথিবীতে বিবর্তনমূলক অভিধান ইতিমধ্যে এত অজস্র তৈরি হয়েছে যে, তাদের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগালে নিশ্চয়ই নতুন করে আমাদের সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হতো না। ভবিষ্যতের বিবর্তনমূলক অভিধানকারগণ (এমনকি বর্তমান সম্পাদকের নেতৃত্বেই কেন নয়!) এই দুর্বলতার দিকে মনোযোগ দিয়েই বিবাঅ যে মহৎ লক্ষ্যটি আমাদের সামনে হাজির করেছে, সেই অভাবটিকে আরও যথাযথভাবে মোচন করবেন–এই আশা থেকেই বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধানকে আমরা আতশ কাচের নিচে ধরার একটা চেষ্টা করব।

দুই.

উৎস হিসেবে মঙ্গলকাব্যের ব্যবহার

বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান নির্মাণ করতে চাইলে অন্যতম প্রধান উপকরণ হবার কথা মঙ্গলকাব্যের। মধ্যযুগের এই উৎসগুলোর ব্যবহারে কতটুকু সক্ষম হয়েছে বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান? অন্তত এটুকু বলা যায় যে, মঙ্গলকাব্যকে উৎস হিসেবে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে বিবাঅ সফল হয়নি। অভিধানটিতে 'মহিষমর্দ্দিনী'র (একইভাবে 'দুর্গা'রও) প্রথম ভুক্তি দেখানো হয়েছে ১৭৫০ সালে–'সিংহপৃষ্ঠে দুর্গা বন্দো মহিষমর্দ্দিনী' (রূপরাম-১৭৫০)। দুর্গার পূজা ব্রিটিশ শাসনের পর বাংলাদেশে চালু হয়, প্রচলিত এই সংস্কারকেই এই ভুক্তিটি উৎসাহিত করবে।

'মহিষমর্দ্দিনী' শব্দটা কি আসলেই এত পরেকার? নাতো! মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর (১৫৪০?-১৬০০) অতিশয় বিখ্যাত কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যানের আস্ত একটি অংশের বিষয়বস্তু হলো 'চন্ডিকার মহিষমর্দ্দিনীরূপ ধারণ' :

'মহিষমর্দ্দিনীরূপ ধারণে চন্ডিকা
অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট যে নায়িকা ॥'

বিবাঅতে 'নায়িকা'র ভুক্তিটাও একই কারণে যথার্থ নয়। বিবাঅ যাকে এই শব্দটির কৃতিত্ব দিচ্ছে, সেই ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের ১৭৬০ সালের অন্তত দেড়শ বছর আগে এই 'নায়িকা' শব্দটির ব্যবহারও ওপরের মুকুন্দরামের উদ্ধৃতিটিতেই জাজ্বল্যমান দেখা যাচ্ছে!

'মহিষাসুর' নিয়েও একই কথা। 'মহিষা ঢাল' ও 'মহিষা দুগ্ধ' বিষয়ে মুকুন্দরাম থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু মহিষাসুরের বেলায় আবারও অষ্টাদশ শতকে ('মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ দারুণ দম্ভ-কৃষ্ণরাম', ১৭২০) আসার কী কারণ থাকতে পারে? মুকুন্দরামেই তো দিব্যি দেখতে পাচ্ছি 'বাম করে মহিষাসুরের ধরি চুল, ডান করে তার বুকে আঘাতিল শূল।' ইতিহাসবিদরা কালকেতু-ফুল্লরার উপাখ্যানকে দেখেছেন বনচারী শিকারজীবী জনগোষ্ঠীর নগর সভ্যতা ও কৃষিকাজের আওতায় আসার সাহিত্যিক দলিল হিসেবে। এই রূপান্তর যেমন সমাজের অভ্যন্তরের রসায়নে ঘটেছে, তেমনি বাইরে থেকে আসা অজস্র আলোড়ন ও উপাদানের সংস্পর্শে আসার এবং সেগুলোকে আত্মস্থকরণেও সেটা সাক্ষ্য। মঙ্গলকাব্যের সূত্রপাতটিও মুসলমানি শাসনের একেবারে শুরুতে। একদিকে মুসলমানের উপস্থিতি, অন্যদিকে বৈদিক বনাম অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ক্ষমতাকাঠামোতে নানান টানাপোড়েন তো বটেই, বিপুল সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতকে ধারণ করেছে এই সাহিত্য, ভাষার বদলকেও। ফলে মঙ্গলকাব্যে যে সকল শব্দের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাদের উল্লেখ অগ্রাধিকার সহকারে বিনা ব্যতিক্রমে করতেই হবে, যদি আপনি কার্যকর একটা বিবর্তনমূলক অভিধান আশা করেন। কিন্তু বেশ অনেকগুলো ভুক্তিতে গুরুতর ত্রুটি দেখে আশঙ্কা জেগেছে, অপরিকল্পনার কারণে মঙ্গলকাব্যের রসদ এই অভিধান তৈরিতে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি।

মঙ্গলকাব্যের সূত্রপাতটিও মুসলমানি শাসনের একেবারে শুরুতে। একদিকে মুসলমানের উপস্থিতি, অন্যদিকে বৈদিক বনাম অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ক্ষমতাকাঠামোতে নানান টানাপোড়েন তো বটেই, বিপুল সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতকে ধারণ করেছে এই সাহিত্য, ভাষার বদলকেও।

এটা অবশ্য বলা হচ্ছে না যে, সব ক্ষেত্রে এই গুরুত্ব দেয়া হয়নি। যেমন–'মুসলমান' শব্দটির বেলায় সেটা হয়তো ঠিকমতোই ঘটেছে ('পাইয়া বীরের পান, বসে যত মুসলমান', মুকুন্দরাম)। কিন্তু 'নামাজ' শব্দটিতেই আবার দেখা যাচ্ছে ১৬৮০ সালের আলাওলে যাওয়া হচ্ছে ('ইচ্ছাগতে পঞ্চ অক্ত নামাজ তরফে')। যদিও ওই কালকেতুর উপাখ্যানেই পাওয়া যাচ্ছে শব্দটির প্রাচীনতর উল্লেখ ('রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা/তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা ॥')। মুকুন্দরাম আর আলাওলের মধ্যে কে বেশি পুরনো? মুকুন্দরামের মৃত্যুর বছর কয়েক পর আলাওলের জন্ম। এমনকি এমন সম্ভাবনাও আমরা উড়িয়ে দিতে পারছি না যে, ঠিকমতো খুঁজলে বাংলা সাহিত্যে 'মুসলমান', 'নামাজ' ইত্যাদি শব্দের প্রাচীনতর উল্লেখও মিলবে; 'দুর্গা', 'মহিষমর্দ্দিনী'–এই দুটি শব্দের বেলায়ও এই সম্ভাবনা প্রযোজ্য। 'কানা' ভুক্তিটিতে বিজয় গুপ্তের সময় দেয়া আছে ১৬৫০, তিনি আরও শ দেড়েক বছর আগের ব্যক্তি হবেন, হয়তো মুদ্রণপ্রমাদ। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর মনসামঙ্গলকাব্য রচনার কাল নির্ণয় করেছেন ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ। তবে বিজয় গুপ্তের আরও বিখ্যাত উক্তি 'প্রথমে রচিত গীত কানা হরিদত্ত, মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য' আরও তাৎপর্যপূর্ণ হতো। অন্তত 'মূর্খ' শব্দটির প্রয়োগে বিবাঅ-তে ১৫৮০ সালের যে কৃষ্ণদাসের কথা আছে 'মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে', তার চেয়ে বিজয় গুপ্তের এই রচনা ঢের প্রাচীনতর। তাৎপর্যপূর্ণ যে, উভয় স্থলেই কবিগণ ধর্ম বিষয়ক তর্কেই অপরকে মূর্খ বলেছেন। মঙ্গলকাব্য এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মবিতর্ক ও ধর্মপ্রচারের প্রাবল্য এতে টের পাওয়া যায়, এমনিতর নানান ধর্মবিতর্কেই বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশের বিকাশ সম্পন্ন হয়েছে। ইতিহাসের এই আঁচটা পাওয়ার জন্যই বিবর্তনমূলক একটা অভিধান যথাযথভাবে নির্মিত হওয়াটা জরুরি।

'জোলা' শব্দটাও দেখুন, মুকুন্দরাম এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তিগত একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন কিছু আগে উল্লেখ করা পঙ্‌ক্তিটিতে ('তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা')। বিবর্তনমূলক শব্দের অভিধানের কাছে এই প্রাপ্তিযোগের আশায়ই তো ভবিষ্যতের পাঠকরা যাবেন। অথচ 'জোলা' বাছাই করা হয়েছে আরও অর্ধশতক পরেকার একটা ভুক্তিতে ('চাচা-ফুফা ডাকে জোলা অতি ত্বরাতরি')। মঙ্গলকাব্যের তাৎপর্য এখানেই, সৌন্দর্য সৃষ্টিতে অনন্য হলেও হয়তো তার চাইতেও বড় ভূমিকা রেখেছে তা ইতিহাসের আকর রক্ষার বেলায়। ওই যে একটু আগে 'পাইয়া বীরের পান বসে যত মুসলমান' উদ্ধৃতিটার কথা বলা হলো বিবাঅ থেকে, সেটা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়তে বসা যে কোনো শিক্ষার্থীর মনে একটা সম্পর্কের স্মৃতি জাগাবে। প্রজাকে পানপাতা বা মুখ থেকে চিবানো পান খেতে দিয়ে স্বীকৃতি দেয়ার ভারতীয় রাজাদের প্রথাটি মোগলরাও গ্রহণ করে, এবং মুকুন্দরামে এই উল্লেখ বাংলায় সেই চলটির কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই রাজার কাছ থেকে প্রজার পান গ্রহণ করার তাৎপর্য, এর মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রতি সুরক্ষা ও আনুগত্যের যে সম্পর্ক তৈরি হতো, তা এই কারণেই ছিল শাসনের অন্যতম পালনীয়

মঙ্গলকাব্য এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মবিতর্ক ও ধর্মপ্রচারের প্রাবল্য এতে টের পাওয়া যায়, এমনিতর নানান ধর্মবিতর্কেই বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশের বিকাশ সম্পন্ন হয়েছে। ইতিহাসের এই আঁচটা পাওয়ার জন্যই বিবর্তনমূলক একটা অভিধান যথাযথভাবে নির্মিত হওয়াটা জরুরি।

আচার। আলোচ্য ভুক্তিতে হিন্দু নগরাধিপতি কালকেতুর কাছ থেকে পান গ্রহণ করছেন মুসলমান বসতিস্থাপনকারীরা।

বিবাঅ-র প্রতি এই নালিশ তাই ভবিষ্যতের গবেষকরা করতে বাধ্য হবেন যে, মঙ্গলকাব্যের মতো মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণতম উৎসগুলোর প্রতি এর সম্পাদকগণ যথাযথ শ্রদ্ধা ও মনোযোগ প্রদান করেননি। এই ব্যর্থতার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে যদিও সম্পাদক নিজেই প্রথম আলোর ওই রচনায় ব্যাখ্যা দিয়েছেন; সময়, জনবল ইত্যাদির অভাব তুলে ধরেছেন, আমরা ক্রমে দেখাতে চেষ্টা করব, পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন আনা হলে একই জনসম্পদে এই সীমাবদ্ধতাও অনেক দূর অতিক্রম করা সম্ভব হতো।

তিন.

মধ্যযুগের অন্য উৎসগুলো ব্যবহার

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি মঙ্গলকাব্যের সূত্রগুলো ব্যবহারে বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (বিবাঅ) ততটা সাফল্য দেখায়নি। মঙ্গলকাব্যই অবশ্য মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও শব্দের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে একমাত্র উৎস নয়। এ ছাড়াও আছে নানা অনুবাদ সাহিত্য, দলিল-দস্তাবেজ, শিলালিপি ও অন্যান্য সূত্র, এমনকি বাংলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলে সংস্কৃত, ফারসি, ইংরেজির মতো বিদেশি ভাষার সূত্রগুলোও নয় কেন? এগুলোতে পাওয়া সম্ভব প্রচুর ভৌগোলিক বিবরণজাত বাংলা শব্দ এবং সংস্কৃতি ও লোকাচার বিষয়ক পরিভাষা।

যেমন–পদ্মা নদী। পদ্মা নদীর ঐতিহাসিক উল্লেখ নির্ধারণ করতে বিবাঅ ব্যর্থ হয়েছে। এটা হতাশাব্যঞ্জক, কারণ এর উৎসটি বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটা। পঞ্চদশ শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন, নদীয়ার বাসিন্দা ছিলেন তিনি, বাংলাপিডিয়া অনুযায়ী তাঁর জীবনকাল ১৩৮১-১৪৬১। পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে তিনি গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (রাজত্বকাল ১৩৯০-১৪১১) বা রাজা গণেশ (রা ১৪১৫-১৮) অথবা জালালুদ্দীন মাহমুদ শাহ (রা. ১৪১৮-১৪৩১) কিংবা রুকনুদ্দীন বরবক শাহ (রা. ১৪৫৯-১৪৭৪) কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন। সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতে পদ্মা নদীর উল্লেখ নেই। পদ্মাস্নান করলে কোনো পুণ্য নেই, সেটা সকলে জানত। কিন্তু গঙ্গার এই বিশাল শাখার উল্লেখ কেন পুরাণাদিতে নেই, অথবা কেন তাতে পুণ্য অর্জন হবে না, সেই প্রশ্ন নিশ্চয়ই আর্য সভ্যতা পূর্ব বাংলার দিকে জাঁকিয়ে বসার পর একটা পর্যায়ে উঠেছিল। রামায়ণের এই অনুবাদকার তাই সম্ভবত নতুন আরেকটি কাহিনি প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন, হতে পারে তা তাঁর সময়ের জনপ্রিয় কাহিনী, হতে পারে তা তাঁর নিজের উদ্ভাবন। কিন্তু আমরা আমাদের জানা নথিগুলোর মধ্যে এখানেই পদ্মা ও পদ্মাবতী যে গঙ্গার সাথে সম্পর্কিত, সেটা প্রথমবারের মতো পাই :

'পদ্মমুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী ॥
শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে।
মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তব নীরে ॥'

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান অনুসারে নদী হিসেবে 'পদ্মা'র প্রথম উল্লেখটি মিলছে রামরাম বসুতে, ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে : পদ্মার মোহনা। বটে! বাংলাদেশের প্রধান নদীটির উল্লেখ বাংলা সাহিত্যে আসতে ঔপনিবেশিক উনিশ শতক পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল, এই ভ্রান্তি তৈরি করার সমূহ ঝুঁকি কি এখানে থাকছে না?

'পদ্মাবতী' নামের ভুক্তিটিতে যে নদীবিশেষ বলা হয়েছে, তা অনির্দিষ্ট ঠেকে। এটা সুনির্দিষ্টভাবে পদ্মা নদীই। একইভাবে 'পঁউয়া' ভুক্তিটিতেও চর্যাপদের পঙ্‌ক্তিটির বাংলা অনুবাদের পাশাপাশি পঁউয়া খাল বলতে যে ওই আলোচনার সময়টিতে পদ্মা নদীকেই বোঝাত তা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল।

এই সূত্রেই অন্য একটি ভাবনারও উদয় হয়, বাংলার বহু নাম ও স্থানের উদ্ভব হয়েছে অথবা প্রথম উল্লেখ হয়েছে একেবারেই অন্য ভাষায়, যেমন–সংস্কৃত, প্রাকৃত বা ফারসি ও আরবি ভাষায়। বাংলায় বিবর্তনমূলক অভিধান করতে গেলে সেগুলোর সন্ধানও জরুরি। যেমন–'গৌড়', 'গৌড়দেশ'–এই সব ভুক্তিতে মিলছে ১৫৮০ সালের কৃষ্ণদাস ('জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয়'), বৃন্দাবন দাশ ('গৌড়দেশ ইন্দ্রজয় নিত্যানন্দ রায়'), কৃষ্ণদাস ('আর যত ভক্তগণ গৌড় দেশবাসী') প্রমুখকে। গৌড়েশ্বরে মিলছে বিদ্যাপতি, ১৪৭০। শুধু 'গৌড়' ভুক্তিটিকে বিবেচনা করলে এই বিবরণ ত্রুটিপূর্ণ, কেননা বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলকাব্যে মিলছে সাহিত্যে গৌড়ের আরও পুরনো উল্লেখ 'নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান ॥ হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত। শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পীরিত'।

পদ্মাবতী উপভুক্তিতে বলা আছে নদীবিশেষ। এর উদাহরণ হিসেবে বলা আছে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের বৃন্দাবন দাসের উদ্ধৃতি, 'পদ্মাবতী নদী বড় দেখিতে সুন্দর'। কিন্তু পদ্মাবতীর এর চেয়ে অনেক পুরনো উল্লেখ পাওয়া যায় তাম্রশাসনে–সংস্কৃত ভাষায়। কেননা তখন রাজকীয় কাজকর্ম সংস্কৃত ভাষাতেই হতো। আধুনিক কালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদ ও তাম্রলিপি ও শিলালেখ বিশেষজ্ঞ দীনেশচন্দ্র সরকারের পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত গ্রন্থটিতে মিলল সতট 'পদ্মাবতী' মানে পদ্মাবতী নদীর তীরে ভূমিদাদের কথা।

কিন্তু যদি আমরা বাংলার বাইরের এবং বাংলা ভাষা বহির্ভূত উৎসগুলো বিবেচনা করার উদারতর দৃষ্টি গ্রহণ করি, 'গৌড়' শব্দটিকে আরও পুরনো সাহিত্যে মিলবে। যেমন–কান্যকুব্জরাজা যশোবর্মার (৭২৫-৫৩) সভাকবি বাক্‌পতিরাজ রচিত 'গৌড়বহো' নামের প্রাকৃত কাব্যের কথা উল্লেখ করেছেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ দীনেশচন্দ্র সরকার। এর সংস্কৃত রূপ 'গৌড়বধঃ', যশোবর্মার হাতে নিহত কোনো এক গৌড়রাজের নিহত হবার কাহিনি এটি। যুদ্ধ ইত্যাদি প্রসঙ্গে গৌড়ের আরও উল্লেখ আছে একই সময়ের কামরুপের রাজার অভিলেখে, আছে কাশ্মীরের 'রাজতরঙ্গিণী' নামের বিখ্যাত সাহিত্যে গৌড়রাজকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণভাবে হত্যার বিবরণ, এবং সেই মন্দির ধ্বংস করতে গৌড়সেনাদের তৎপরতার কথা।

এমনিভাবে, পদ্মাবতী উপভুক্তিতে বলা আছে নদীবিশেষ। এর উদাহরণ হিসেবে বলা আছে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের বৃন্দাবন দাসের উদ্ধৃতি, 'পদ্মাবতী নদী বড় দেখিতে সুন্দর'। কিন্তু পদ্মাবতীর এর চেয়ে অনেক পুরনো উল্লেখ পাওয়া যায় তাম্রশাসনে–সংস্কৃত ভাষায়। কেননা তখন রাজকীয় কাজকর্ম সংস্কৃত ভাষাতেই হতো। আধুনিক কালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদ ও তাম্রলিপি ও শিলালেখ বিশেষজ্ঞ দীনেশচন্দ্র সরকারের পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত গ্রন্থটিতে মিলল সতট 'পদ্মাবতী' মানে পদ্মাবতী নদীর তীরে ভূমিদাদের কথা। বিবরণে দীনেশচন্দ্র লিখছেন :

'ফরিদপুর জেলার ইদিলপুরে প্রাপ্ত দশম শতাব্দীর চন্দ্রবংশীয় রাজা

শ্রীচন্দ্রের শাসনে পদ্মা (পদ্মাবতী?) নদীর সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন এ অঞ্চলে পদ্মা নামের যে ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা ছিল, পরে গঙ্গার পূর্ব শাখার জলস্রোত তার খাতে পড়ার ফলে সেটি ক্রমে সুবৃহৎ নদীতে পরিণত হয়ে পদ্মা নাম পায় বলে মনে হয়। বিগত কয়েক শতাব্দীতে পদ্মা নদীর বহু বিবর্তন ঘটেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন পদ্মা এক সময় রামপুর বোয়ালিয়ার কাছ দিয়ে চলন বিলের পথে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার খাতে ঢাকা পেরিয়ে মেঘনার নিম্নভাগে পড়ত; কিন্তু অষ্টাদশ শতকে নদীটি ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে এসে দক্ষিণ শাহাবাজপুর দ্বীপের উপর দিকে কুমিলা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরের প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণে মেঘনার মোহনায় মিলিত হয়। মুর্শিদাবাদের নবাবগণের সভাসদ রাজা রাজবল্লভের নির্মিত রাজনগর এক সময় পদ্মার বাম তীরে অবস্থিত ছিল এবং নিকটবর্তী কালীগঙ্গা নদী পদ্মা ও মেঘনাকে সংযুক্ত করত। রাজনগর প্রভৃতি বহুজনের কীর্তি পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ায় এখানে নদীর নাম হয় কীর্তিনাশা।'

একইভাবে, মীর্জা নাথান রচিত বাহারীস্তান-ই-গায়বী নামের স্মৃতিকথার বাংলা অনুবাদে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত কোচরা মোগল বাহিনীর সৈন্যদেরকে 'বাঙাল' বলত। এর কারণ কী জানি না, হয়তো ইতিমধ্যেই বাংলা মুলুকে মোগলদের অধিকারের কল্যাণেই এটা ঘটেছে।

সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় রচিত উৎসে যদি বাংলা মুলুকে ব্যবহৃত শব্দের শুরুর দিককার উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সূত্র হিসেবে গুরুত্ব দিয়েই ব্যবহার করতে হবে, ইতিহাসবিদরা যেভাবে পর্যটক, আগ্রাসনকারী কিংবা বণিকদের স্মৃতিকথাকে ব্যবহার করেন। প্রয়োজনে এগুলোর জন্য পৃথক অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করা যেতে পারে। কেননা এই সকল উৎস তো বাংলা ভাষার বিকাশের ধারাটিকে কোনো না কোনোভাবে ধারণ করেছে। বিদেশি ভাষায় বাংলা ভাষার এই শব্দগুলোর ব্যবহারের উল্লেখ মিললে তা তো কেবল এটিই প্রমাণ করে যে, শব্দটি ইতিমধ্যেই প্রচলিত হয়ে গিয়েছে।

চার.

সকল ভুক্তিতে যে এই বিবর্তনের পথটি যথাযথভাবে ধরা পড়েনি, তা নয়। নিশ্চিতভাবেই বহুসংখ্যক ভুক্তিতেই বিবাঅ সফল হয়েছে। পাঠক খুব তৃপ্তির সাথে পড়তে পারবেন 'কাগজ' ভুক্তিটি। ফারসিজাত এই শব্দটি, এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাটির আগমন মুসলমানি শাসনে। পঞ্চদশ শতকে কাগজ ক্রমাগত ভূর্জপত্রকে প্রতিস্থাপিত করতে থাকে। বাংলার কাগজ বিশেষভাবে মসৃণ ও সাদা হতো, সেটা মা হিয়েন তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তেও উল্লেখ করেছেন। হয়তো আরও পুরনো উল্লেখ ঘাঁটলে পাওয়া যাবে, কিন্তু আপাতত মুকুন্দরামেই আমাদের জানা সবচেয়ে পুরনো উল্লেখটি বিবাঅতে আছে ('কাগজী ধরিলা নাম কাগজ করিয়া')। শুধু তা-ই নয়, কাগজের অর্থের বিবর্তনের ছাপটিও বিবাঅতে পাওয়া যাবে, কাগজ যে আদালতের সাক্ষ্য বস্তু হতে পারে, কাগজ হয় কোম্পানির কাগজ–বদলে যাওয়া সময়ের ছাপ মোটামুটি সন্তোষজনকভাবেই পাওয়া যাবে এখানে।

প্রায় নিখুঁত আরেকটি ভুক্তি যেমন 'বাঙ্গাল'। পরিহাসমূলকভাবে পূর্ববঙ্গবাসী অর্থে ব্যবহৃত 'বাঙ্গাল' শব্দটির তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ ১৫৮০ সালে বৃন্দাবন দাসের 'বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া' বিবাঅতে ভুক্ত হয়েছে। মধ্যযুগের অবসানেও এই পরিহাস বন্ধ হয়নি। তবে শব্দের বিবর্তনই যদি আমরা সন্ধান করতে চাই, অভিধানকারদের আরেকটু অগ্রসর তবে হতেই হবে। বাঙ্গাল এই পরিহাসের জবাব ফিরিয়ে দেয়া সম্ভবত শুরু করেছিল উনিশ শতকে। পূর্ববঙ্গে রচিত গ্রন্থাদি শুদ্ধ করতে হলে পশ্চিমবঙ্গের কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নেয়া দরকার–সংবাদ প্রভাকরের এমন একটি প্রস্তাবের জবাবে ১৫ আশ্বিন ১২৭৩; ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ সংখ্যায় 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় কেন পূর্ববঙ্গবাসীদের বাঙ্গাল বলা হয় সে নিয়ে পাঠানো এক প্রশ্নের জবাবে ঢাকা প্রকাশের পরিহাস : 'পত্রপ্রেরকের লিঙ্গজ্ঞান থাকিলে বুঝিতেন; বাঙ্গাল শব্দটি পুংলিঙ্গ, আর বাঙ্গালী শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ।'

এমন আরও অনেক মানসম্পন্ন ভুক্তির কথা বলা যাবে, যেমন– 'পলায়ন', 'পালানো' প্রভৃতি। তবু ভবিষ্যতে এগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রস্তাবের পথও নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যায়নি। যেমন– 'পালানো' শব্দটার বাংলা সাহিত্যে একটা বিখ্যাত ব্যবহার হলো 'তারা বলে মোরা বর্গি চোখে দেখি নাই, লোকের পলানি দেখে আমরা পলাই'। বর্গির হামলার সমকালীন গঙ্গারাম দাসের এই 'পলানো' শব্দটার ব্যবহার গণ-আতঙ্কজনিত গণপলায়নের সাহিত্যিক উদাহরণ হিসেবে ঠাঁই পাবার দাবি রাখে।

পাঁচ.

উনিশ শতকের সামাজিক আলোড়ন ও বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান জীবনী ও আত্মজীবনী

নানা সীমাবদ্ধতার কারণেই হয়তো বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (বিবাঅ) প্রণেতাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অনেক জীবনীগ্রন্থের প্রতিও সমান মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির নাম পেলাম না অভিধানের উৎসগুলোর মাঝে। এই শিক্ষাব্রতী ১৮৮৭ সালে সার্থক একটি পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্য বই লিখেছিলেন, যদিও সেটা এমন উদ্যোগের দিক থেকে ছিল দ্বিতীয়। অনেক খেটেখুটে প্রাকৃতিক ভূগোলেরও প্রথম পাঠ্য বই তিনি লিখেছিলেন। আরও অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তক তিনি রচনা করেছিলেন, যেগুলো বাংলা ভাষায় আধুনিক পর্বের প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত পাঠ্যপুস্তকের নিদর্শন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আত্মজীবনীটি যদিও মৃত্যুর বেশ পরে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এই আত্মজীবনীতে সংবাদ পাওয়া যায় বহু পূর্বে উনিশ শতকের শেষ দিকে তাঁর রচনা করা, জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হওয়া পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের ভাষা নিয়ে বহু বিতর্কের। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য একটি মাত্র উদাহরণ ব্যবহার করা যাক। যোগেশচন্দ্র নতুন একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন, 'মৌলিক পদার্থ'। 'মৌলিক' শব্দটির এই প্রয়োগের নিন্দা করে 'পদার্থবিদ্যা' নামের আরেকটি পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা লেখেন, 'কুলীন পদার্থ থাকলে মৌলিক পদার্থ থাকত'। কে এই আলোচ্য পদার্থবিদ্যার গ্রন্থকার, সেটা উদ্‌ঘাটনও বিবাঅ উদ্যোক্তাদের দায়িত্ব, কেননা বাংলা একটি শব্দের তাৎপর্য পাল্টে যাবার এমন অসাধারণ একটা উদাহরণের সাথে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির সাথে তিনিও যুক্ত।

'মৌলিক' ভুক্তিটিতে আছে ভারতচন্দ্রের ১৭৬০ সালের 'মৌলিক কায়স্থ, পদবীতে হোড়'। এখানে মৌলিক বলতে কায়স্থের সম্ভ্রান্ত বংশগত অবস্থান বোঝানো হয়েছে। এর পরেরটি আছে মূল অর্থে, বঙ্কিম ১৮৮৭ : 'দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত'। কিন্তু এরপর জগদীশচন্দ্রে যাওয়া হয়েছে প্রথম উদ্ভাবিত এই অর্থে, 'যুগান্তকারী গবেষণাসমূহ তাহাদের মনে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরি করিয়াছে।'

ভুক্তিগুলো জরুরি সন্দেহ নেই। কিন্তু মাঝখানে হারিয়ে গিয়েছে মৌলিক পদার্থ বোঝানো ভুক্তিটি, যা ছাড়া বাংলা ভাষায় রসায়ন পাঠ শুরু করাই সম্ভব না। মৌলিক পদার্থের মতো একটি প্রয়োজনীয়

পরিভাষার জন্মের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া যদি সম্ভব না-ও হয়, শব্দটার বর্তমান ব্যবহারের জন্মোল্লেখের সন্ধান অন্তত আমাদের জানা দরকার। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির সেই পাঠ্যপুস্তকগুলো চোখে দেখার সৌভাগ্য ব্যক্তিগতভাবে আমাদের হয়নি, কিন্তু সেগুলোর সন্ধান অসম্ভব নয় মোটেই। এমনকি তাঁর তথ্যঠাসা আত্মজীবনীটা যথাযথভাবে ব্যবহার করলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত অজস্র শব্দের প্রথম ব্যবহারের নিদর্শন উদ্ধার করতে কোথায় কোথায় অভিযান চালাতে হবে, সেই সূত্রগুলো অন্তত পাওয়া যাবে।

অণুবীক্ষণ নাই, বীক্ষণ ভুক্তিতে কী কী যেন আছে বিবাঅতে। অনুবীক্ষণ শব্দটিরও একটি পুরনো ব্যবহারের খবর মিলল যোগেশচন্দ্রের আত্মজীবনীতেই, সেখানে তিনি স্বরচিত 'রত্নপরীক্ষা' নামের একটা গ্রন্থের সংবাদ দিয়েছেন। সেখানাকার উদ্ধৃত অংশে শব্দটির সহজ সাবলীল প্রয়োগ থেকে অনুমান হয়, এই শব্দটা বাংলা ভাষায় এর আগেই প্রচলিত হয়ে গেছে, সাল তারিখ উল্লেখ না পেলেও তাঁর পূর্ববর্তীরা যে শব্দটি ববহার করেছেন, তার কিছু নিদর্শন আছে।

ছয়.

যোগেশচন্দ্র হয়তো পুরনো ভুলে যাওয়া দিনের লোক! জাতীয় মননে নিজের ইতিহাসকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হলে যদিও অন্তত শিক্ষা ও প্রযুক্তিচিন্তা বিকাশের ইতিহাসে তিনি এভাবে বিস্মৃত হতেন না, কিন্তু সেই নালিশও যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ভুলতেই পারেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের আরেকজনের দুঃখ দেখে। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম নেই বিবাঅতে। সত্যেন বসুর বিজ্ঞান সম্পর্কিত অজস্র বাংলা লেখা ঘাঁটলে নতুন শব্দের, কিংবা শব্দের তাৎপর্যবৃদ্ধির সন্ধান পাওয়া যেতে পারত। নেই আচার্য প্রফুলচন্দ্রের নামও। এঁরা পরস্পরের সাথে বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিষয়ে বিরাট সব বিতর্ক করেছেন, পরিভাষার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও আত্মীকরণের প্রক্রিয়াটি নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যও রেখেছেন, মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ তিক্ততাও সৃষ্টি করেছেন–সব মিলিয়ে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চায় প্রাণপাত করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম নেই বিবাঅতে। সত্যেন বসুর বিজ্ঞান সম্পর্কিত অজস্র বাংলা লেখা ঘাঁটলে নতুন শব্দের, কিংবা শব্দের তাৎপর্যবৃদ্ধির সন্ধান পাওয়া যেতে পারত। নেই আচার্য প্রফুলচন্দ্রের নামও। এঁরা পরস্পরের সাথে বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিষয়ে বিরাট সব বিতর্ক করেছেন, পরিভাষার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও আত্মীকরণের প্রক্রিয়াটি নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যও রেখেছেন, মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ তিক্ততাও সৃষ্টি করেছেন–সব মিলিয়ে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চায় প্রাণপাত করেছেন।

উনিশ শতকের মহাজনেরা ব্রিটিশ আমলে যখন বাংলায় শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে নেমেছিলেন, কাজটা কঠিন ছিল, পথটা ছিল অজানা। কিন্তু সামাজিক উদ্দীপনার অভাব ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ বসু শেষ কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব, যাঁরা উপনিবেশ-উত্তর পর্বের ম্লান ও উৎসাহহীন পরিবেশে যুদ্ধটা চালিয়ে গেছেন। বিবাঅতে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য এইটুকু যথেষ্ট নয়। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ মৌলিক রচনা ও অনুবাদ তাঁর আছে যে, তাঁর হাতের ছাপ বাংলা বিজ্ঞানচর্চার ভাষায় থাকবে না, তা প্রায় অসম্ভব। 'পাউলি ও তাঁর পরিবর্জন নীতি' নামে তিনি স্বাদু বাংলায় গদ্য লিখেছেন, লিখেছেন বহু নিবন্ধ। পরিবর্জনের এই ব্যবহার সম্ভবত টেকেনি, অপবর্জনই ব্যবহৃত হয় এখন। কিন্তু অপবর্জনও তো নেই বিবাঅতে। পরিবর্জন বা অপবর্জন যা-ই হোক না কেন, তাদের উল্লেখটা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা বিকাশের ধারাকে বোঝার জন্য জরুরি।

সত্যেন বসুর এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান চর্চা যে সম্ভব, সেটা প্রমাণ করা, লক্ষ্য ছিল তরুণ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞানের প্রণোদনা তৈরি করা। বর্জন শব্দটা এখানে পদার্থবিদ্যার একটা বিশেষ পরিভাষা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, এর সাথে সামাজিক সম্পর্কের বর্জনের সাদৃশ্য সামান্যই। কিন্তু বর্জিত থেকে গেল এই শব্দগুলো। সত্যেন বসুর উদ্যোগে খানিকটা ধুলোবালি জমেছে সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানে প্রচলিত বাংলা পরিভাষাগুলোর জন্মের সুলুকসন্ধান তো ভাষার ইতিহাস নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

'আলোকবর্ষ' শব্দটির প্রথম ব্যবহারে আছেন কবি জীবনানন্দ দাশ! সত্যতা বিশ্বাস করা কঠিন হলেও বিষয়টা চমকপ্রদই হবার কথা। কিন্তু বাংলায় রচিত বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক, পত্রিকা-সাময়িকীকে এই মাত্রায় অবহেলা দেখানো বিবাঅ যে শিরোপা জীবনানন্দকে দিয়েছে, সেটা আরেকটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে গ্রহণে কবিও হয়তো কিছুটা কুণ্ঠা বোধ করবেন।

সাত.

সামাজিক আন্দোলন

বাংলা ভাষায় প্রচুর নতুন শব্দের প্রবর্তক কিংবা প্রস্তাবক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ভাষাকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের, বিশেষত বিজ্ঞান-ভূগোল-দর্শনের উপযুক্ত করার সমস্যা নিয়ে যাঁরা ভেবেছেন এবং নতুন নতুন শব্দ প্রস্তাব করেছেন তাঁদের মাঝে তিনি অগ্রণী। শুধু তা-ই না, তাঁর হাত দিয়ে অজস্র শব্দ বর্তমান অর্থে স্থিত হয়ে পরিণতিও পেয়েছে। তাঁর এই অগ্রণী ভূমিকাটিকে স্মরণে রেখেই একটা বিপজ্জনক ভ্রান্তি আমাদের যথাসম্ভব এড়ানোর চেষ্টাও করা উচিত, সেটা হলো : সম্ভাব্য প্রথম ব্যবহারকারী হিসেবে কোথাও রবীন্দ্রনাথ অনুমিত হলে যথাসাধ্য চেষ্টা করা তাঁর পূর্বের কোনো ভুক্তি আছে কি না।

যেমন–'নমশূদ্র' ভুক্তির প্রথম উল্লেখটি আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 'সে নমশূদ্রদের পাড়ায় যায়', ১৯১৫। কিন্তু বাংলায় 'নমশূদ্র' শব্দটির জন্মের ইতিহাস ও তৎসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক জটিলতা এই ভুক্তিটি দিয়ে ধারণাই করা যাবে না। পূর্ব বাংলার বিশেষত দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষিজীবী হিন্দু সম্প্রদায়কে 'চন্ডাল' জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে হিন্দু সমাজ বহির্ভূত করা হয় ১৮৯১ সালের আদমশুমারির গণনার জাতি বিভাজনে। এর ভিত্তি ছিল ভদ্রশ্রেণীর উচ্চতর বর্ণহিন্দুদের মর্যাদাবোধ। কিন্তু এই আদমশুমারির আগে থেকেই এই উত্তেজনা চলে আসছিল। এর আগেই ১৮৭০ দশকে বাকেরগঞ্জ ও ফরিদপুর এলাকার হিন্দু ভদ্রশ্রেণীর সাথে তাদের সকল রকম সামাজিক বিচ্ছেদ শুরু হয় মর্যাদার প্রশ্নে। বোঝা যায় এই উত্তেজনা বেশ আগে থেকেই ঘনীভূত হচ্ছিল। সম্ভবত এই দ্বন্দ্বের রেশ ধরেই 'নমশূদ্র' কথাটির আবির্ভাব বাংলা ভাষায়। উনিশ শতক জুড়েই কাছাকাছি সময়ে পুরো বাংলা প্রদেশ জুড়েই অজস্র এমনতর মর্যাদা পাবার আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের কৈবর্ত চাষিরা উপবীত ধারণ করার সামাজিক আন্দোলনে রত হয়েছেন। পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয় মর্যাদা দাবি করেছেন। এছাড়া উত্তরবঙ্গেও ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কিংবা এমন কোনো বেদস্বীকৃত উচ্চকুলের সাথে নিজেদের উৎপত্তিকে সম্পৃক্ত করে নতুন সামাজিক অধিষ্ঠান ঘোষণা করেছেন।

'নমশূদ্র' বাংলায় একেবারেই নতুন একটি সম্প্রদায়, চণ্ডাল অভিধা

মুছে দিয়ে যে তার মর্যাদার দাবিতে সংগঠিত এবং সেই অনুযায়ী রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশাল এক কর্মযজ্ঞের প্রবাহ। এই কর্মযজ্ঞের তীব্রতা দিনে দিনে কী পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা বোঝা যাবে এই 'নমশূদ্র' শব্দটি গ্রন্থ-শিরোনামেই আছে, এমন কী পরিমাণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটা চিত্র থেকে। ১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) খুলনা থেকে প্রকাশিত একটা গ্রন্থের নাম পাওয়া যাচ্ছে নমশূদ্র দর্পণ। ১৯১৪ (১৩২১ সালে) সরল নমশূদ্র দ্বিজদর্পণ, খুলনা থেকেই। ১৯১১ সালে নমশূদ্র দ্বিজতত্ত্ব, বরিশাল। ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল ন্যাশনাল নমশূদ্র অ্যাসোসিয়েশন। নিশ্চয়ই, বিশাল ব্যাখ্যার সুযোগ একটা বিবর্তনমূলক অভিধানে থাকে না। কিন্তু বিবর্তনমূলক অভিধান প্রণয়ন করতে হলে, নমশূদ্র আন্দোলনের মতো একদা গভীর ও যুগান্তরকারী আন্দোলনের ভুক্তির বেলায় নমশূদ্রদের নিজস্ব দলিলগুলো থেকে উল্লেখই বাঞ্ছনীয় হবার কথা। বিশেষ করে সেটা যখন কালের দিক দিয়েও বেশ খানিকটা অগ্রবর্তী।

কিন্তু বিবর্তনমূলক অভিধান প্রণয়ন করতে হলে, নমশূদ্র আন্দোলনের মতো একদা গভীর ও যুগান্তরকারী আন্দোলনের ভুক্তির বেলায় নমশূদ্রদের নিজস্ব দলিলগুলো থেকে উল্লেখই বাঞ্ছনীয় হবার কথা। বিশেষ করে সেটা যখন কালের দিক দিয়েও বেশ খানিকটা অগ্রবর্তী।

তবে সত্যি কথা যে, নমশূদ্রদের এই মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি ভদ্রশ্রেণীর বিরূপতা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য ছিল বলে রবীন্দ্রনাথের একটা চরিত্রের ১৯১৫ সালে নমশূদ্রদের সম্মেলনে যাবার তাৎপর্য কম নয়। সেটা শিক্ষিত সমাজের উদার অংশের মনোভাবের প্রতিনিধি স্থানীয় হবে। সেই প্রয়োজনেই এই ভুক্তিটি থেকে যেতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই অতি অবশ্যই তার চেয়ে পুরনো ভুক্তিগুলো উল্লেখ করতেই হবে। এমনকি, এই উল্লেখগুলোর অনেকগুলো ইংরেজি ভাষায় হয়ে থাকলেও তা আমাদের শব্দের ইতিহাসের সাথেই সম্পর্কিত, বিধায় সেগুলোকেও উৎস হিসেবে বিবেচনা করা কর্তব্য, যে যুক্তিটি আমরা এর আগেই সংস্কৃত ও ফারসি সূত্রগুলো সম্পর্কে দিয়েছি। ইতিহাসবিদরা উল্লেখ করেছেন যে, মণকে মণ আবেদনপত্র জমা পড়েছিল সাহেবদের দফতরে এই প্রশ্নটির মীমাংসা করতে। ফলে নমশূদ্র, চণ্ডাল ইত্যাদি বিষয়ক ভুক্তিতে আদমশুমারিটিসহ এর আগেকার কোনো ঔপনিবেশিক দলিলপত্রে আছে কি না, তারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। একই কথা অন্য সকল বিষয়েও প্রযোজ্য।

আট.

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধানে উৎস হিসেবে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সরকার রচিত বাংলা ১৩২৩ সনে (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত শ্রীশ্রী হরি লীলামৃত গ্রন্থটির ব্যবহার আদৌ নেই। এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল নমশূদ্র সম্প্রদায়ের যুগান্তকারী নতুন ধর্মীয় আন্দোলন 'মতুয়া' ধর্মমতের উদ্‌গাতা ফরিদপুরের কেওড়াকান্দির শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্য। গঠনগত ও রূপগত দিক দিয়ে এ যেন এক আধুনিক কালের চৈতন্য চরণামৃত। পার্থক্য এই যে, বর্ণের রাজনীতির পাকেচক্রে এই কীর্তিমান ব্যক্তিটি চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো সর্বজনীন স্বীকৃতি পাননি। নিজ নমশূদ্র সম্প্রদায়কে অসম্মান থেকে মুক্তি দেয়াই ছিল তাঁর আরাধ্য, সম্প্রদায়ের বাইরে তাঁর বাণীর বিস্তার ঘটেছে কম। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের, এবং সেই অর্থে তাঁর তাৎপর্য হ্রাস পায়নি। আবির্ভাবের পর থেকে '৪৭ সালের দেশভাগ পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে অন্যতম নির্ধারক শক্তি ছিল মতুয়া সম্প্রদায়। গ্রন্থটির ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর আজীবন-জীবনী, অর্থাৎ জন্ম, বাল্যখেলা , কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রসাদ প্রেরণ, লীলা প্রকাশ প্রাচুর্য্য প্রভৃতি বহুতর উপদেশপূর্ণ বচনাবলী সম্বলিত কবি রসরাজ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত।'

যা হোক, এই গ্রন্থটিতে স্থানীয় ও লোকজ অজস্র বাংলা শব্দের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যাবে, সেগুলো বিবাঅ থেকে প্রাচীনতর। কিংবা, পাওয়া যাবে শব্দের ভিন্ন তাৎপর্যমণ্ডিত ব্যবহারের উল্লেখও। যেমন–'বুনো'। বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধানে এই ভুক্তিতে ১০টি উল্লেখ আছে। এর মধ্যে বন্য প্রাণী (ছাগল, পাখি, মোষ, হাতি ও হাঁস), বৃক্ষাদি (শিম ও ফুল) এবং সব শেষে স্বভাব অর্থে বুনো। সবচেয়ে পুরনোটি দেয়া আছে রবীন্দ্রনাথ থেকে, ১৮৮১ সালের ('একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ')। এই ভুক্তির সাথে দ্বিতীয় যে ব্যক্তিটির নাম উল্লেখ আছে, তিনি বিভূতিভূষণ, ১৯২৩ সালে।

কিন্তু 'বুনো' শব্দটি বাংলা ভাষায় অনির্দিষ্ট কয়েকটি জনজাতিকে বোঝাতেও তো ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারটা কত পুরনো জানি না, শব্দটার সাথে পরিচয় ঘটেছে বহু বছর ধরে দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন মারফতই, এই জনগোষ্ঠীর সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি, একবার দুবার যানবাহন থেকে চোখের দেখা হয়েছে। হয়তো কৃষি সংস্কৃতিতে উত্তরিত হতে না পারা কোনো প্রাচীন অরণ্যচর জাতির অবশেষ হবেন এরা, কিংবা পরবর্তীকালে এসেও থাকতে পারেন। তেমন কোনো সংবাদ কেউ জানাতে পারেননি। পত্রিকায় মাঝে মাঝেই তাদের দুর্দশা নিয়ে প্রতিবেদন দেখে ভ্রাম্যমাণ শিকারি কিংবা আহরণজীবী বলে ধারণা হয়েছিল। অধিকাংশ প্রতিবেদন সেই পদ্মা অববাহিকার ফরিদপুর-যশোর অঞ্চলে, যেখানকার আদি জনগোষ্ঠীকে চণ্ডাল বলে থাকত সেই ভদ্রলোক শ্রেণী, যা মতুয়া ধর্মের উৎপত্তির কারণ। দেখুন ওই 'শ্রীশ্রী হরি লীলামৃত' বুনো জাতি নিয়ে কিছু কথা :

'বুনোজাতি তারা ক্ষেত করিয়াছে ভালো।
নব নব বেগুনে করেছে ক্ষেত আলো ॥
দেখি দুই তিন বন্দে বেগুন উত্তম।
তার মধ্যে এক বন্দে অতি মনোরম ॥
বুনোজাতি নাম তার বুধই সর্দার।
তাহার বেগুন ক্ষেত বড়ই সুন্দর ॥'

বুনো কিন্তু এখানে বনে বাসকারী জাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, বরং বেগুনের চাষ করা এক গৃহস্থকেই বুনো হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই 'বুনো' অভিধাটিই ইঙ্গিত দেয় তাদের অনেকেই তখনো প্রধানত প্রাক-কৃষি পর্বের জীবিকার সাথে যুক্ত। এমনকি বেগুন ফলালেও কৃষকসুলভ আরও বহু বৈশিষ্ট্য তাদের নেই, সেটাও কাব্যে একটু পরই জানানো হয়েছে। মতুয়া ধর্ম যাদের মাঝে প্রচারিত হয়েছিল, তাদেরকে উচ্চতর মর্যাদার গোষ্ঠীগুলো চণ্ডাল বলে অভিহিত করলেও এই কাব্যটি পাঠ করলে বোঝা যায়, বুনোরা নমশূদ্রদের তুলনায়ও ছিল মর্যাদাহীন, কৃষি সংস্কৃতির মাপকাঠিতে বিবেচনা করলে আরও একধাপ পিছিয়ে থাকা। কিন্তু মতুয়া ধর্ম এবং শ্রীশ্রী হরি এমনকি এই জাতহীন, সবার নীচে থাকা বুনোদের মাঝেও প্রেম বিলাতে, তাদের ভক্ত হিসেবে গ্রহণে কার্পণ্য করেননি, আলোচ্য আখ্যানটিতে তারই বর্ণনা আছে।

চিড়া কিংবা মুড়ি না বানাবার অভ্যস্ততা হয়তো বুনোদের নিকট

সাম্প্রতিক কালে কৃষির সংস্কৃতির আওতায় আসারই ইঙ্গিতবহ, কেননা বিবাঅ থেকেই আমরা জানি যে, মধ্যযুগের সাহিত্যেই চিড়া, চিড়াভাজার উল্লেখ প্রচুর আছে। 'ভাজাভুজি'তে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ থাকলেও 'ভাজাপোড়া' শব্দটি বিবাঅতে নাই, যদিও 'ভাজাপোড়া' শব্দটিই 'ভাজাভুজি'র চেয়ে বেশি প্রচলিত। 'ভাজাপোড়া'র উল্লেখ এখানে মিলছে :

'বুড়ি বলে মোরা বুনো শোন ওরে বাবা।
ভাজাপোড়া ঘরে নাই খেতে দিব কিবা ॥
চিড়া না বানাই মোরা মুড়ি না বানাই।
বানাইতে নাহি জানি ভাত মাত্র খাই ॥
বুধই বলেছে মাতা বড় ক্ষুধা পাই।
মা বলেছি তব ভাত খেলে দোষ নাই ॥
বুড়ি ভাবে মা বলে চরণে দিল হাত।
ভক্তি করে সেবা দিল খেতে চায় ভাত ॥
বড়ই মমতা হ'ল বুড়ির অন্তরে।
জল দেওয়া পান্তাভাত দিল বুধইরে ॥'

বিবাঅতে 'পান্তা ভাত' ভুক্তিটিতে সংজ্ঞাটি কোনোক্রমে উল্লেখ করে বলা আছে বিদ্যা, ১৮৯১। কোনো সাহিত্যিক উদাহরণ নেই। কিন্তু পান্তা ভাতের মতো প্রায় জাতীয় খাদ্যে পরিণত হওয়া, সামান্য প্রস্তুতিতে পাওয়া দিনের প্রথম খাবারটির উল্লেখ কৃষিসংস্কৃতিপুষ্ট বাংলা সাহিত্যে এর আগে না থাকার সম্ভাবনাটা অস্বস্তিকর ঠেকে।

নয়.

নিতান্তই আধুনিক সূত্রসমূহ

প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দুটো ভুক্তি নিয়ে আলাপ তোলা যাক। সাহিত্যকর্মী অর্থে 'সাহিত্যিক' শব্দটি কখন প্রথম ব্যবহৃত হয়? বিবাঅ বলছে :

"মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয়; সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।" রবীন্দ্রনাথ, ১৯০৭ সাল।

কিন্তু 'সাহিত্যিক' শব্দটা এখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেনা 'সাহিত্যকর্মী' অর্থে ব্যবহার করেননি। রবীন্দ্রনাথ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন, বিবাঅ অনুসারেই, 'সাহিত্য বিষয়ক' অর্থে।

ওদিকে প্রমথ চৌধুরী কিন্তু 'সাহিত্যিক' শব্দটির ব্যাকরণগত যথার্থতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলা পৌষ ১৩১৯ সালে, মানে ইংরেজি ১৯১২ সালে। বর্তমানে প্রচলিত সাহিত্যকর্মী হিসেবে সাহিত্যিকের ব্যবহার নিয়ে আপত্তি ছিল তাঁর, কারণ তিনি মনে করতেন শব্দটি ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ নয়। 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধু বাংলা' নামের প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

"'সাহিত্যিক' এই বিশেষণটি বাংলা কিংবা সংস্কৃত কোন ভাষাতেই পূর্বে ছিল না, এবং আমার বিশ্বাস, উক্ত দুই ভাষার কোনটির ব্যাকরণ অনুসারে 'সাহিত্য' এই বিশেষ্য শব্দটি 'সাহিত্যিক'-রূপ বিশেষণে পরিণত হতে পারে না। বাংলার নব্য-সাহিত্যিকদের বিশ্বাস যে, বিশেষ্যর উপর অত্যাচার করিলেই তা বিশেষণ হয়ে ওঠে। এইরূপ বিশেষণের সৃষ্টি আমার মতে অদ্ভুত সৃষ্টি।"

প্রমথ চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্বের কাছে অশুদ্ধ শব্দ হিসেবে চিহ্নিত হবার পরও 'সাহিত্যিক' শব্দটা কিভাবে সাহিত্য যিনি করেন, ধীরে ধীরে তাঁর পরিচয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল, সেই অনুসন্ধান কি জরুরি নয়? যতদূর দেখা যাচ্ছে, 'ঢাকা রিভিউ' নামের যে পত্রিকাটির সমালোচনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী 'সাহিত্যিক' শব্দটিকে খারিজ করেছিলেন, সেখানেই প্রথম সাহিত্যকর্মী অর্থে 'সাহিত্যিক' শব্দটির ব্যবহার ঘটেছিল। পত্রিকাটি শব্দটি উদ্ভাবন করেছিল সমাজে নতুন গড়ে ওঠা সাহিত্যকর্মী বর্গটির পরিচিতি হিসেবে, নাকি ইতিমধ্যেই প্রচলিত শব্দটি তারা ব্যবহার করেছিল, আমরা তা জানি না। উল্লেখ্য, সাহিত্যকর্মী হিসেবে 'সাহিত্যিক' শব্দটার উল্লেখ বিবাঅতে প্রথমবার হিসেবে দেখানো হয়েছে, সেটি প্রথম চৌধুরী-ঢাকা রিভিউ বিবাদের বেশ পরেরকার, ১৯২১ সালের।

সাহিত্যকর্মী অর্থে সাহিত্যিকের এই ব্যবহার বিষয়ে বিবাঅতে প্রমথ চৌধুরীর এই উল্লেখ তো থাকা দরকারই, 'ঢাকা রিভিউ'র সেই সংখ্যার সন্ধানের চেষ্টাও প্রয়োজন 'সাহিত্যিক' শব্দটির আধুনিক অর্থে ব্যবহারের সুলুকসন্ধানে। এমন যদি হয়ে থাকে যে সাহিত্যকর্মী হিসেবে 'সাহিত্যিক' শব্দটার প্রথম ব্যবহার ঢাকা শহরের 'বিশেষ্যর-ওপর-অত্যাচার-করা' কিংবা ব্যাকরণ-ভাঙা কোনো সাহসী উদ্যোগ থেকেই শুরু হয়েছিল, তার তাৎপর্য আছে বৈকি!

শুরুতে সাহিত্য সম্পর্কিত অর্থে ব্যবহার করলেও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সাহিত্যকর্মী বোঝাতেই 'সাহিত্যিক' শব্দটা ব্যবহার করেছেন, যেমন–মুন্সী প্রেমচান্দ সম্পর্কে এবং আরও কয়েকটি প্রসঙ্গে। ফলে তিনিও হতে পারেন এর প্রচলনকারী, না-ও হতে পারেন। বর্তমান নিবন্ধকার রবীন্দ্রসাহিত্যে সাহিত্যকর্মী অর্থে যতগুলো উল্লেখ পেয়েছেন সাহিত্যিকের, তার প্রতিটি প্রমথ চৌধুরীর এই বিতণ্ডার পরবর্তীকালের ঘটনা। সাহিত্যকর্মী অর্থেও যদি রবীন্দ্রনাথই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে থাকেন, তা যেমন উদ্ধৃত হওয়া প্রয়োজন ছিল, কোনো অবস্থায়ই প্রমথ চৌধুরীর তোলা বিতর্কটির উল্লেখ বাদ দিয়ে এই ভুক্তি পূর্ণতা পেতে পারে না, কেননা তা বাংলা ভাষার ব্যাকরণগত শুদ্ধতা বিষয়ক বহু তর্কে আজও আলো দেখাতে সক্ষম।

প্রমথ চৌধুরীর মতো তুলনামূলক উদার ও সহনশীল মানুষও কত অনায়াসে ভাষার গতিশীলতা ও মানুষের প্রয়োজনবোধের গতির সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হলেন, বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসের রীতিমতো আধুনিক কালের সেই ছবিটা তুলতে, দেখাই যাচ্ছে, বিবাঅ সক্ষমতা দেখায়নি।

'ভাষাভাষী' শব্দটার ভুক্তিতে বিবাঅ দেখিয়েছে ১৯৩৩ সালের একটি উদ্ধৃতি, বুলবুলের : 'বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমান'। কিন্তু এই শব্দটা নিয়েও এর এক যুগ আগেই কাণ্ডটা ঘটে গিয়েছে। 'ঢাকা রিভিউ' নামের ওই একই পত্রিকায় এই শব্দটির ব্যবহার নিয়ে আপত্তি জানিয়ে একই রচনায় প্রমথ লিখেছেন :

"'ভাষাভাষী' সমাসটা এতই অপূর্ব যে, ও কথা শুনে হাসাহাসি করা ছাড়া আর কিছু করা চলে না।"

'ভাষাভাষী' পরিভাষাটির প্রথম অস্তিত্বের সংবাদও আমরা এখন পর্যন্ত পাচ্ছি আলোচ্য ওই 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকাটি প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর নিন্দার উপলক্ষেই। বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই প্রমথ চৌধুরীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর মতো তুলনামূলক উদার ও সহনশীল মানুষও কত অনায়াসে ভাষার গতিশীলতা ও মানুষের প্রয়োজনবোধের গতির সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হলেন, বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসের রীতিমতো আধুনিক কালের সেই ছবিটা তুলতে, দেখাই যাচ্ছে, বিবাঅ সক্ষমতা দেখায়নি।

নয়.

কার্যকর বিবর্তনমূলক অভিধান রচনার পথসন্ধান

কলেবর বৃদ্ধি করার সুযোগ থাকলে এমন অজস্র গুরুত্বপূর্ণ শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে বিবাঅ কতটা উদাসীন থেকেছে, সেগুলোর বিবর্তনের রূপটিকে দেখানোর তেমন চেষ্টা করেনি; সেটা বিস্তারিত দেখানো যেত। কিন্তু আলোচনাকে এই পর্যন্ত সীমিত রেখেই বরং অন্য দুটি প্রস্তাব আমরা করতে চাই।

প্রথমত বিবর্তনমূলক একটি অভিধান প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন কেবল শব্দ খোঁজা কর্মিবাহিনী নয়; বিশেষ বিশেষ কতকগুলো পেশার এমন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, যাঁরা বাংলা ভাষাটাও ভালো জানেন। বিবাঅর প্রধান কুশীলব গোলাম মুরশিদের জবানিতে জানতে পারা যায় এই কাজের জন্য লোকবল বাছাই প্রক্রিয়ার কথা :

"তার পরের দিন থেকেই শুরু হলো লোক খোঁজা। জন পঁচিশ প্রার্থীর মধ্য থেকে প্রথমে আটজনকে বেছে নিলাম। এঁদের কেউই আগে কোনো দিন অভিধানের কাজ করেননি। কাজেই সহকর্মী নির্বাচন করে উল্লসিত অথবা আশাবাদী হয়েছিলাম–এ কথা বলতে পারছি না। কিন্তু নতুন অভিধান, নতুন কর্মী–এটা এক ধরনের সুবিধা।"

এই কর্মিবাহিনীকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারা যায় না। দুরূহ এই কাজটির কায়িক শ্রমের প্রায় পুরোটাই তাঁরা সম্পন্ন করেছেন, দালানের পরিকল্পনাগত ত্রুটির দায় তাঁদের নয়। জানাই যাচ্ছে তাঁদের পারিশ্রমিকও খুব বিশাল ছিল না। তবে তাঁদের সাথেই আরো দরকার ছিল সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান শাখার ব্যক্তিদের সমন্বয়। প্রয়োজন ছিল অন্তত কজন ইতিহাসবিদের পরামর্শ নেয়ার, কজন বাংলা সাহিত্যের শিক্ষকের পরামর্শ নেয়ার। একইভাবে এক বা একাধিক চিকিৎসক, আইনজীবী, ভূগোলবিদ কিংবা এজাতীয় সংশ্লিষ্ট পেশার ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন ছিল। এমনকি কয়েকজন খ্যাতনামা ধর্মতাত্ত্বিকেরও পরামর্শ জরুরি ছিল, প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ও উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়ার। এঁরা ৯টা-৫টা কর্মঘণ্টা ধরে শব্দ খুঁজবেন না; বরং কী কী গ্রন্থ থেকে শব্দগুলো খুঁজতে হবে, তার পেশাগত পরামর্শ দিতে পারবেন। সেটা করা হয়েছে কি না, তা আমরা গোলাম মুরশিদের ভাষ্যে পাইনি। এই বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধানের যা ঘাটতি, সেটা মেটানোর কথা কল্পনাও করা যায় না এই ব্যক্তিদের সহায়তা ছাড়া।

কিন্তু সেটাতে বাস্তব একটা বাধা আছে, তা আমরা জানি। সেটা তহবিলের সংকট। আমাদের মেনে নিতে হবে যে, বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান তৈরির কাজটি যতই জরুরি হোক না কেন, তত বড় একটা কাজের রসদ কেউ আপাতত জোগাবে না, যদিও বহুগুণ অর্থ নিয়তই বিদেশে পাচার হতে থাকবে। গোলাম মুরশিদের লেখায়ই আছে তারও সাক্ষ্য :

"আমরা একটা জানালাবিহীন ঝুল আর ধুলো ভরা পরিত্যক্ত বড় কক্ষ পেয়েছিলাম আমাদের অভিধান নির্মাণের কারখানা হিসেবে। সেখানে নতুন আসবাবপত্র এসেছিল। পুরনো কম্পিউটার এসেছিল। সমস্ত ঘরটা ভরে গিয়েছিল মাল্টিপ্লাগ আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বৈদ্যুতিক তারে। মোট কথা, কাজের জন্য খুব অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলাম, সেকথা হলফ করে বলতে পারছি না। অনেক সময় কর্মচারীরা বেতন পেতেন মাসের আট-দশ দিন চলে যাওয়ার পর।"

আরও আছে :

"আমরা যেহেতু শব্দের ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছি প্রথম ব্যবহার এবং পরবর্তী ব্যবহারসমূহের দৃষ্টান্ত খুঁজে, সেজন্য বই এবং পত্রপত্রিকা পড়ে আমাদের শব্দগুলো খুঁজে বের করতে হয়েছে। আমাদের যাত্রা শুরু চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে। চর্যাপদের সব শব্দ বাংলা ভাষায় টিকে থাকেনি, তবু তার প্রতিটি শব্দই আমরা নিয়েছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সব শব্দও নিতে চেষ্টা করেছি। এভাবে যদি পুরো বাংলা পুঁথিগুলো এবং ছাপানো বইগুলো ব্যবহার করতে পারতাম, তাহলে বাংলা ভাষার তাবৎ শব্দ আমাদের জালে ধরা পড়ত। কিন্তু সেভাবে করতে গেলে বিশ-তিরিশ বছর সময় লেগে যেত। আমাদের হাতে তেমন অঢেল সময় ছিল না। তাছাড়া বই জোটানোও সম্ভব ছিল না। তাই আমরা কেবল নির্বাচিত কিছু বইপত্রই ব্যবহার করেছি।"

আমরা আগেই দেখিয়েছি, চর্যাপদের কিংবা মধ্যযুগের পরিচিত সাহিত্যের যথাযথ ব্যবহার বিবাঅ নির্মাতারা সন্তোষজনকভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এর পরও, সামর্থ্য যা আছে, সেটাকেই যথাসম্ভব বাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টাটাও তো জরুরি। এমনকি নিজদের সংগতিতে না কুলালে বাইরে সমাজের আর পাঁচজনের কাছে সাহায্য চাওয়াতে দোষের কিছু নেই। সেটা বিরাট উপকারের হতে পারে, বিশেষ করে কাজটির সাথে যখন বাংলাভাষী সকলেরই স্বার্থ জড়িত। আমরা নগদ সাহায্যের কথা বলছি না, যদিও সেটা মিললেও মন্দ হতো না। আমরা গায়ে খেটে সহায়তার কথাও বলছি।

এই রকম সহযোগিতার একটা কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ সম্প্রতি ঘটেছে। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের গার্ডিয়ান পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী, ইসরায়েলি পুরাতত্ত্ববিদরা ছয় মাস ঘুরে ঘর্মক্লান্ত হয়েছেন এমন একটি খুঁড়ে পাওয়া বস্তুকে কয়েক ঘণ্টায় চিহ্নিত করেছেন সামাজিক গণমাধ্যমের সাধারণ নাগরিকরা। শৌখিন তদন্তে শেষ পর্যন্ত জানা গেল আবিষ্কৃত বস্তুটি কোনো পুরাবস্তু নয়, এটি একটি আধুনিক পণ্য।

আরও ব্যাপক আকারে জনসাধারণের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াকে এই বিবর্তনমূলক অভিধান নির্মাণের কাজটিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তার প্রক্রিয়াটি কঠিন নয়। বিবাঅ কর্তৃপক্ষ তাদের তালিকাভুক্ত শব্দগুলোর ভুক্তিসমূহকে অন্তর্জালে সহজলভ্য করে দিতে পারে। কোনো আমপাঠক বিবাঅর উল্লেখিত সময়ের চেয়ে পুরনো কোনো পুস্তকে শব্দটির উল্লেখের সন্ধান পেয়ে থাকলে তারা সেটা মন্তব্যের ঘরে জানিয়ে দেবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে। জানিয়ে দেবে ইতিহাসের কোন কালপর্বে শব্দটির ব্যবহার ও অর্থ পরিবর্তিত হবার নিদর্শন থেকে থাকলেও। এমনকি নতুন নতুন কোনো ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব বিষয়েও তাদের পরামর্শ চাওয়া যেতে পারে। এই আলাপগুলো আলাপ বা মন্তব্য অংশে থাকবে, ইচ্ছুকরা তাতে অংশ নেবেন। ছোট্ট একটি যোগ্য ও দক্ষ সম্পাদনা পরিষদ এমনই সকল পরামর্শ, প্রস্তাব ও তথ্য যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করে দেবে। গোলাম মুরশিদ তাঁর লেখায় অনুমান করেছেন, মোটামুটি আদর্শ একটা বিবাঅ তৈরি করতে বিশ-তিরিশ বছর লাগত। নয় কিলোগ্রাম ওজনের যে তিন খণ্ডে বিবাঅ ছাপা হয়েছে, আমাদের আলোচ্য প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করলে অনেক দ্রুত সময়েই–অবশ্যই বিশ-তিরিশ বছর নয়–আরও যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট ভুক্তিসংবলিত একটি বিবাঅর সংশোধিত সংস্করণ ওই নয় কিলোগ্রামেই ছাপা সম্ভব হবে। কলেবর আরও বর্ধিত করার সুযোগ থাকলে জন-অংশগ্রহণের এই পদ্ধতিতেই আঠারো কিলোগ্রামেও গুণগত মান আরও বৃদ্ধি করেই সেটি প্রকাশিত হতে পারবে। প্রয়োজনে এভাবে সহায়তাকারী নাগরিকদের নামও

স্বেচ্ছাসেবী তালিকায় উল্লেখ করা যেতে পারে। বিপরীতে অজস্র পুঁথি ঘাঁটার তহবিল ও জনবল নেই বলে কাজটাকে দায়সারাভাবে সম্পন্ন না করে বরং একটা বিভ্রান্তিকর জ্ঞানকোষ আমরা পেতে থাকব।

দশ.

এই প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করে অভিধান রচনার প্রক্রিয়াটিকে সর্বজনের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে সেই অভাবটি অনেকদূর মোচন হতো, যে অভাবের কথা আমরা জানতে পারছি গোলাম মুরশিদের লেখায়, "কারণ কারো রচনাই পুরো পড়ার মতো সময় আমাদের ছিল না। এমনকি রবীন্দ্রনাথের নয়, নজরুল ইসলামের নয়, অথবা জীবনানন্দ দাশেরও নয়। রচনা পড়ে সংকলকের যে অর্থ মনে হয়েছে, তা সর্বত্র মিলিয়ে দেখাও সম্ভব হয়নি। তা-ও সময়ের অভাবে। আমার ধারণা, পাঁচ বছর সময় পেলে অভিধানটা আরেকটু ভালো হতো। দশ বছর সময় আর দশজন অভিজ্ঞ কর্মী পেলে অভিধানটা সত্যি সত্যি ভালো হতো। কিন্তু আমরা কথা বলছি কী হতে পারত তা নিয়ে নয়, কী হয়েছে, তা নিয়ে।"

পুরোটা রবীন্দ্রনাথ, পুরোটা নজরুল অথবা পুরোটা জীবনানন্দ পড়া আছে এমন অজস্র পাঠক দেশে পাওয়া যাবে। মধ্যযুগের সাহিত্য আলাদা আলাদাভাবে পাঠ করা আছে এমন পাঠকের সংখ্যাও অজস্র না হলেও আছে। আছে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার ইতিহাস বিষয়ে কমবেশি জানাশোনা ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের সহায়তা আহ্বান করে দেখা যেতে পারে সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতাকে অতিক্রম করা যায় কি না। মানুষের উৎসাহে আস্থা রেখে একথা বলা যায়, এই কাজে অংশ নেয়ার জন্যই আজকের ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ হয়তো নিজেকে মধ্যযুগের পুঁথি কিংবা বৈষ্ণব পদাবলী অথবা মঙ্গলকাব্যের গবেষক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রেরণা পেতেন।

এই পরিস্থিতিটা অনেকদূরই লাঘব করা সম্ভব হবে, যদি আমরা যে কোনো অভিধান নির্মাণের কাজটাকে আরও খানিকটা মুক্ত করে দিতে পারি জনপরিসরে। পুরোটা রবীন্দ্রনাথ, পুরোটা নজরুল অথবা পুরোটা জীবনানন্দ পড়া আছে এমন অজস্র পাঠক দেশে পাওয়া যাবে। মধ্যযুগের সাহিত্য আলাদা আলাদাভাবে পাঠ করা আছে এমন পাঠকের সংখ্যাও অজস্র না হলেও আছে। আছে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার ইতিহাস বিষয়ে কমবেশি জানাশোনা ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের সহায়তা আহ্বান করে দেখা যেতে পারে সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতাকে অতিক্রম করা যায় কি না। মানুষের উৎসাহে আস্থা রেখে একথা বলা যায়, এই কাজে অংশ নেয়ার জন্যই আজকের ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ হয়তো নিজেকে মধ্যযুগের পুঁথি কিংবা বৈষ্ণব পদাবলী অথবা মঙ্গলকাব্যের গবেষক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রেরণা পেতেন।

আমরা অবশ্য এভাবে কথা বলছি কী হতে পারত তাই নিয়ে শুধু নয়, ভবিষ্যতে কী হতে পারে, সেই বিষয়েও। এবং এ কারণেই কী হতে পারত সেই আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, এই পরিমাণ তথ্য অন্তর্জালে বাংলা ভাষায় সহজলভ্য হলে সেটারও একটা গুরুতর প্রভাব বাংলা ভাষা চর্চার ওপর পড়তে বাধ্য। এই কারণেও দাবি থাকবে বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধানের তথ্যগুলো অন্তর্জালে প্রকাশ করা এবং তা নিয়ে সেখানেই আলোচনা বিস্তারের সুযোগ করে দেয়ার।

তহবিলের অভাবে গোলাম মুরশিদ বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। ভারতে ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার ৬৫০ রুপি পারিশ্রমিক নিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করে দিয়েছিলেন, সেই পাঠ্যপুস্তক লাখ লাখ সংখ্যায় বিক্রি হয়েছে। থাপার ওই পাঠ্যপুস্তকগুলো রচনায় যতটা পরিশ্রম করেছেন, তার তুলনায় অনেক লঘু পরিশ্রম করেই এই অভিধান রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ, সাধারণ পাঠকরাও। তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ ও অন্তর্জাল সেই সুযোগটি করে দিয়েছে আমাদের জন্য। প্রশ্ন হলো, আমরা যথাযথ মানুষগুলোকে যুক্ত করতে চাইছি কি না, তাঁদেরকে যুক্ত করার চেষ্টাটা কতদূর করেছি? এবং এই নিশ্চয়তা দেয়া যায় যে, এমন মানুষ দেশে অজস্র না থাকলেও অনেক আছেন নিশ্চিতভাবেই। শুধু প্রয়োজন হলো তাঁদের কাজকে যথাযথ স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেয়া, তাঁদেরকে যুক্ত করার আন্তরিক উদ্যোগ নেয়া। দুনিয়ার সকল কিছু হয়তো টাকায় মেলে, টাকা দিয়ে সব কিছুকে হয়তো মানসম্পন্ন করাও যায়, তবু যথাযথ তদারকির আওতায় রেখেই কোনো কাজকে সামাজিক উদ্যোগে পরিণত করা গেলে তা থেকে সবচেয়ে কম বিনিয়োগে সর্বোচ্চ পরিমাণ শস্য ফেরত পাওয়া সম্ভব। আমার চেনা বহু অগ্রগণ্য পেশাজীবী-শিক্ষক-বিশেষজ্ঞই নামমাত্র অথবা বিনা পারিশ্রমিকেই এই কাজটিতে যুক্ত থাকতে চাইবেন, একথা প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি। প্রয়োজন অর্থায়ন থেকে শুরু করে একেকটা ভুক্তির রচনা প্রক্রিয়া পর্যন্ত আগাগোড়া পুরো প্রক্রিয়াটিকে এমনভাবে পরিচালনা করা, যেন একদিকে সম্পদের প্রকট অভাব, অন্যদিকে সুগভীর জাতীয় প্রয়োজন–এ দুই বিপরীত বাস্তবতার অনুধাবনে জনগণের মাঝেই এই বিশাল উদ্যোগ নিয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়, যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে মানুষ যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এমন যে কোনো ভবিষ্যৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নে।

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধানের মতো স্বপ্ন দেখতে পারার জন্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ পেতে পারে, আরও ধন্যবাদের দাবিদার এর অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্মিবাহিনী। এই অভিধানের ভুলত্রুটি যা-ই থাকুক, একে বাস্তবায়নের শ্রমসাধ্য কাজটা তাদেরই করতে হয়েছে। তাদের সকলকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ফিরোজ আহমদ: রাজনীতিবিদ, লেখক, গবেষক।
ইমেইল: subarnasava@gmail.com